সচেতন প্রয়াস ও মস্তিষ্ক — একটি প্রশ্ন

এস. কুমার

পৃথিবীর উপর প্রতিটি জীব প্রজাতিকে তার বিবর্তনের পর প্রথম যে কাজটি করতে হয়েছে তা হোল প্রকৃতি ও তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার পদ্ধতি তৈরী করা। এই পদ্ধতিকে একটু পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলা যেতে পারে অভিযোজন ব্যবস্থা। প্রায় প্রতিটি প্রজাতিই এই অভিযোজন ব্যবস্থা নির্মাণ করেছে তার নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে এবং প্রকৃতি-পরিবেশকে তারা সেভাবেই গ্রহণ করেছে বা করে ঠিক যেভাবে প্রকৃতি-পরিবেশ নিজের মধ্যে অবস্থান করে। অর্থাৎ কোন জীব প্রজাতিই নিজের প্রয়োজনমত প্রকৃতি-পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করতে পারে না বা সেভাবে অভিযোজন ব্যবস্থা নির্মাণ করেনি।

এই অভিযোজন ব্যবস্থা নির্মাণের নেপথ্যে এক ধরণের সচেতন প্রয়াস সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এটা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের সচেতন প্রয়াস এবং সমগ্র জীবজগতে এটা সাধারণ (common), অর্থাৎ কোন প্রজাতিই এর বাইরে নয়। প্রজাতি — তা এককোষী, বহুকোষী, অমেরুদন্ডী, মেরুদণ্ডী যাই হোক্ না কেন; প্রতিটি জীব প্রজাতির জীব হিসেবে সক্রিয় থাকার প্রধান শর্ত শরীর-সংগঠনের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত অসংখ্য জৈব-ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের নিয়মিত সংঘটন। এইসব জৈব-ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ শরীরের বাইরে প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গেপ্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মিলিত হয়। যথা খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন এবং আত্মরক্ষা। এগুলি একটি প্রজাতির আচরণগত Behavioural বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি এবং প্রাথমিক স্তরের সচেতন প্রয়াসের উৎস।

কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে একবার অভিযোজন ব্যবস্থা তৈরী হয়ে গেলে তা প্রজাতির অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে এবং পরবর্তী জনুক্রম (Generation) গুলির সদস্যরা সেই অভিযোজন ব্যবস্থাকে অনুকরণের মাধ্যমে অনুশীলন করে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। অতএব প্রাথমিক স্তরের সচেতন প্রয়াস একদিকে যেমন অভিযোজন ব্যবস্থা নির্মাণের নেপথ্য কারণ তেমনি অন্যদিকে অনুকরণের মাধ্যমে তার ধারাবাহিক অনুশীলনের কারণও এই প্রাথমিক স্তরের সচেতন প্রয়াস।

মানুষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের সচেতন প্রয়াস একইরকম হলেও মানুষের অভিযোজন ব্যবস্থা অবশিষ্ট জীবজগৎ থেকে মূলগতভাবেই পৃথক। উদ্দেশ্য অভিযোজন হলেও মানুষ যে ব্যবস্থাটা তৈরী করেছে তাকে আমরা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা বলে থাকি। অবশিষ্ট জীবজগতের অভিযোজন ব্যবস্থার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য এই যে এই ব্যবস্থাটি ক্রম পরিবর্তনশীল এবং এর প্রধান ভিত্তি প্রকৃতি-পরিবেশকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে গ্রহণ করা। কীভাবে এবং কেন যে মানুষ অবশিষ্ট জীবজগৎ থেকে নিজেকে এভাবে পৃথক করতে সক্ষম হল তা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এখন পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্ককেই অন্যতম ভূমিকাগ্রহণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইদানীং জিনগত বৈশিষ্ট্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মস্তিষ্ক বা জিনগত বৈশিষ্ট্য সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা নির্মাণে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা খুঁজে দেখা।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মানব মস্তিষ্ক

মানুষ স্তন্যপায়ী পর্বভূক্ত প্রাইমেট বর্গের প্রাণী। প্রাইমেট বর্গের প্রায় সমস্ত প্রজাতির মস্তিষ্কই যথেষ্ট উন্নত। এছাড়া সকল পর্বের মেরুদন্ডী প্রজাতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)। অতএব মানুষের সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে মস্তিষ্কের অবদান হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে অবশ্যই অন্যান্য প্রজাতির মস্তিষ্কের তুলনায় মানব মস্তিষ্কের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

প্রকৃতি-পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য মানুষকে বিভিন্ন সময়ে বস্তুজগতের নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ও নানাবিধ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অনুসরণ ও অনুধাবন করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মানুষ কখনও দলগতভাবে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ করেছে এবং করছে। বস্তুতঃ মস্তিষ্কের ভূমিকা এখান থেকেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যারা ব্যক্তিগতভাবে এই কাজগুলি করেছেন বা করছেন তাদের মস্তিষ্ক আবার মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রমী মনে করা হয় এবং ব্যক্তিক্রমী মস্তিষ্কের সুবাদে প্রতিভা, বুদ্ধি ও জ্ঞান — এই শব্দগুলি প্রচলন লাভ করেছে।

অতএব সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা নির্মাণে মানব মস্তিষ্কের ভূমিকাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে মানবমস্তিষ্ক অপরাপর প্রজাতির মস্তিষ্কের আপেক্ষিকে ব্যতিক্রমী প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। একই সাথে মানুষের মধ্যে আবার কিছু মানুষের আরও ব্যতিক্রমী মস্তিষ্ক থাকতে পারে, এটাও প্রমাণ করা আবশ্যক।

যে কোন বস্তু — তা জড়ই হোক বা সজীবই হোক — একটির থেকে অপরটির পার্থক্য হতে পারে দু'ভাবে, যথা পরিমাণগত এবং গুণগত। মানব-মস্তিষ্কও এর ব্যতিক্রম নয়। মানব-মস্তিষ্কের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলেও এর পরিমাণগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য সমূহ সহজভাবে অনুধাবন করতে হবে।

পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবজগতে মানবমস্তিষ্কের অবস্থান

সামগ্রিক স্নায়ুতন্ত্রের শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় অংশের নাম মস্তিষ্ক। কিন্তু এরকম সংহত স্নায়ুতন্ত্র সমস্ত প্রজাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। উদ্ভিদ জগতে পুরোপুরি অনুপস্থিত। প্রাণীজগতেও সমস্ত প্রজাতির স্নায়ুতন্ত্রে মস্তিষ্কের উপস্থিতি স্পষ্ট নয়। স্নায়ুতন্ত্রের ন্যূনতম একক এক বিশেষ ধরণের দেহকোষ যার নাম নিউরন। অতএব এককোষী প্রাণী প্রজাতিগুলিতে স্নায়ুতন্ত্রের উপস্থিতির কোন প্রশ্নই নেই। শুধু এককোষী প্রাণী প্রজাতিই নয়, নিম্নশ্রেণীর অনেক বহুকোষী প্রাণী প্রজাতির মধ্যেও নিউরন দ্বারা গঠিত কোন স্নায়ুতন্ত্র নেই। মোটামুটি স্পষ্টভাবে স্নায়ুতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব দেখা যায় কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি অঙ্গুরীমাল জাতীয়

মোঙ্গলদের অপেক্ষাকৃত বেশী অবদান থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব তা নয়। ইংরেজ, কোরীয় এবং পশ্চিম এক্সিমোদের মস্তিষ্কের আয়তন অত্যন্ত কাছাকাছি। অথচ সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশে এদের ভূমিকার মধ্যে পর্বত প্রমাণ পার্থক্য।

মস্তিষ্কের পরিমাণগত অবস্থার তুলনামূলক আলোচনায় আয়তন ব্যতিরেকে ভরও একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা। শরীরের ভরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মস্তিষ্কের ভর তৈরী হয়। অর্থাৎ শরীর ও মস্তিষ্কের ভরের মধ্যে একটা আনুপাতীক সম্পর্ক বিদ্যামান — এরকম একটা চিন্তার প্রাবল্য দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। এই চিন্তার প্রাবল্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি যুক্ত তা হল এই যে মানুষের ক্ষেত্রে এই আনুপাতীক সম্পর্কটা ব্যতিক্রমী এবং এজন্যই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি প্রভৃতি শব্দগুলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর শারীরিক ওজন 03 গ্রাম থেকে শুরু করে 150 মেট্রিক টন পর্যন্ত হতে পারে এবং মস্তিষ্কের ভর 74 মিলি গ্রাম (বাদুর) থেকে শুরু করে 10 কিলোগ্রাম (তিমি মাছ) পর্যন্ত হতে পারে। অতএব স্তন্যপায়ী প্রাণীকূলে শারীরিক ভর-পার্থক্য যেখানে পাঁচ কোটি গুন পর্যন্ত হতে পারে, মস্তিষ্কের পার্থক্য সেখানে মাত্র এক লক্ষ তিরিশ হাজার গুন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পরিণত মানুষের মস্তিষ্কের ভর প্রায় 1.40 কিলোগ্রাম। অতি ক্ষুদ্র রোডেন্ট (Rodents) এর মস্তিষ্ক ভর তাদের শরীরের 10%। মানুষের ক্ষেত্রে এটা 2%, শূকরের ক্ষেত্রে 0.1% এবং নীল তিমির ক্ষেত্রে .01%। অতএব দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রভরের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্ক ভর আনুপাতীক হারে বড়। কিন্তু এর ভিত্তিতে কোন সূত্রায়ন সম্ভব নয়। যখন একটি নির্ধারিত প্রাণী শরীরের বিভিন্ন সীমাগুলির (Parameter) মান অপর কোন প্রাণী শরীরের সংশ্লিষ্ট সীমাগুলির মানের সাথে আনুপাতীক হারে মেলে না তখন এই ঘটনাকে আমরা অ্যালোমেট্রি (Allometry) বলি। মস্তিষ্কের আকৃতি (size) মূল্যায়ণের স্বার্থে অ্যালোমেট্রি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রজাতির প্রকৃত মস্তিষ্ক ভর এবং অপর একটি সম আকৃতি সম্পন্ন প্রজাতির মস্তিষ্ক ভরের আপেক্ষিকে প্রথমোক্ত প্রজাতির কাঙ্ক্ষিত মস্তিষ্ক ভরের অনুপাতকে Encephalisation Quotient (EQ) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

EQ = Ea/Ee

Ea = প্রকৃত মস্তিষ্ক ভর, Ee = কাঙ্ক্ষিত মস্তিষ্ক ভর। কাঙ্ক্ষিত মস্তিষ্ক ভর নির্ণয়ের জন্য স্নেল (Snell, 1891) Regression Analysis এর প্রস্তাব করেন। তিনি মস্তিষ্ক-ভর এবং শারীরিক ভর সম্পর্কিত তথ্যাবলী দ্বি-লগারিদ্‌মিক্ গ্রাফে (Double Logarithmic Graph) স্থাপন করে লক্ষ করেন যে তথ্যগুলি কম-বেশী একটা সরলরেখাকে অনুসরণ করে। যদি এই সরলরেখাকে তথ্যগুলির সঠিক বর্ণনা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় তাহলে স্নেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্ক-ভর ও শারীরিক ভরের মধ্যেকার সম্পর্ক দাড়াঁয় নিম্নরূপ।

$E = KS^{\alpha}$

E = মস্তিষ্ক ভর, S=শারীরিক ভর, K = ছেদক রেখা এবং α = সরলরেখার পশ্চাদমুখী ঢাল (slope)।

স্নেল এই প্রসঙ্গে আরও প্রস্তাব করেন যে মস্তিষ্কের আকার শরীরের উপরিভাগের (Body Surface) সাথে সমানুপাতীক। তিনি এই প্রস্তাব অনুসরণ করে শারীরিক ভর এবং মস্তিষ্ক-ভরের মধ্যেকার রেখার ঢাল (α) তত্ত্বগতভাবে নির্ণয় করেন এবং তার মান দাঁড়ায় নিম্নরূপ।

$\alpha = \frac{2}{3} = 66.6$

স্নেল α-এর মান প্রমাণের জন্য উষ্ণরক্তের 47 টি প্রজাতিকে নিয়ে একটি পরীক্ষা চালান। এই 47 টি প্রজাতির মধ্যে 22 টি স্তন্যপায়ী এবং 25 টি পাখী প্রজাতি। পরীক্ষা চালিয়ে তিনি α-এর মান পেলেন 0.68 এবং তিনি এই মানকে তাঁর সূত্রের যথার্থ প্রমাণ হিসেবে মনে করলেন। পরবর্তীকালে জেরিসন্ (Jerision-1988, 1994) স্নেলের প্রস্তাবিত α-এর মানকে $\frac{2}{3}$ ধরে নিয়ে আরও বৃহদাকার প্রাণী প্রজাতি নিয়ে একইরকম পরীক্ষা চালান এবং তিনি স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে α-এর মান পেলেন 0.78 যা স্নেলের সূত্রকে প্রমাণ করে না।

পরবর্তীকালে আরও বৃহদাকারে বিভিন্ন পর্বের মেরুদন্ডী প্রাণী প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যে ফল পাওয়া গেছে তা আরও হতাশাজনক। সাতটি গ্রুপের মেরুদন্ডী প্রাণী প্রজাতিদের মধ্যে α এবং EQ এর মানে এত পার্থক্য যে তা কোনরকম সাধারণ সূত্রায়নের পরিপন্থী। সাইক্লোস্টমের ক্ষেত্রে α-এর মান 0.21 যা সবচাইতে কম। উভচরের α-এর মান 0.55, কিন্তু সরীসৃপের ক্ষেত্রে তা 0.53। EQ এর পরিবর্তনীয়তার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপগুলির একটি সজ্জা (Sequence) থাকলেও α এবং EQ এর পরিবর্তনীয়তার কোন সজ্জা নেই।

সারণী-3

গ্রুপের নাম	প্রজাতির সংখ্যা	α	EQ এর পরিবর্তনীয়তা %
সাইক্লোস্টম (cyclostomes)	05	0.21	39%
কনড্রিকথায়িস (chondrichthayes)	61	0.56	68%
অস্ট্রিক্থায়িস (ostrichthayes)	878	0.639	52%
উভচর (Amphibians)	118	0.55	37%
সরীসৃপ (Reptiles)	74	0.53	43%
পাখী (Birds)	221	0.59	46%
স্তন্যপায়ী (Memmals)	1174	0.739	55%

বর্তমান সারণীতে মূল সারণীর প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি রাখা হয়েছে।

অতএব স্নেল মস্তিষ্ক-ভর এবং শারীরিক ভরের মধ্যে সম্পর্ক তৈরীর জন্য যে সূত্র তৈরী করেছিলেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছেনা। তিনি কিছু অল্প সংখ্যক প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষা করার কারণে α-এর মান 2/3 এর অনেক কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু বিভিন্ন গ্রুপের অনেক বেশী সংখ্যক প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মস্তিষ্ক ভর এবং শারীরিক ভরকে কোন সাধারণ সমীকরণ দ্বারা সম্পর্কিত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোন প্রজাতির মস্তিষ্কের আকার, আয়তন ও ভর একেবারেই তার নিজস্ব বিবর্তনিক বৈশিষ্ট্য। জৈব বিবর্তন এত সুশৃংখলভাবে ঘটেনি যে প্রজাতির মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি কোন এক বা একাধিক সাধারণ নিয়ম মেনে বিকাশ লাভ করেছে। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব মানব মস্তিষ্কের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য প্রজাতির থেকে পৃথক হলেও তার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু নেই।

প্রাণী প্রজাতিতে। কিন্তু মস্তিষ্ক বলতে যে সংহত কোষীয় সংগঠনকে বোঝায় তা বহু ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। একটা শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় অংশ আছে ঠিকই, কিন্তু গঠন বৈচিত্র্যে তা শরীরের অন্যান্য অংশে উপস্থিত স্নায়ুতন্ত্র থেকে আদৌ পৃথক নয়। সমগ্র অমেরুদন্ডী পর্ব জুড়ে ক্রমশঃ স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু বিকাশের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ স্নায়ুতন্তুর বিস্তৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মস্তিষ্ক বলতে যা বোঝায় তা অমেরুদন্ডী পর্বের প্রাণী প্রজাতিতে অনুপস্থিত। মস্তিষ্কের শুরু মেরুদন্ডী প্রাণীতে। বস্তুতঃ মেরুদন্ডের বিবর্তনের সঙ্গে মস্তিষ্কের বিবর্তন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মেরুদন্ডী পর্বের প্রাণীতে ধাপে ধাপে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে। মেরুদন্ডী পর্বের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী প্রজাতিতে (মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী) মস্তিষ্কের গঠনে ব্যাপক সাদৃশ্য বর্তমান। সাদৃশ্যের পরিমাণটা আবার এক একটি শ্রেণীর প্রজাতির মধ্যে আরও ব্যাপক। যেমন পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্য যতটা, শুধু স্তন্যপায়ী প্রজাতিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য তার চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রজাতিতে মস্তিষ্কের পরিমাণগত অবস্থা কার উপর নির্ভর করবে তার কোন ধরা বাধা নিয়ম কোন ক্ষেত্রেই নেই।

মস্তিষ্কের পরিমাণগত অবস্থাকে দুটি দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে। যথা, আয়তন ও ভর। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্ষেত্রে পরিণত দশায় যে কোন একক প্রাণীর ভর বা আয়তন প্রায় একই। শরীরের এই ভর বা আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সংশ্লিষ্ট প্রজাতির মস্তিষ্কের ভর বা আয়তনকে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে এর অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাতির তুলনামূলক আলোচনাকে বাদ দিয়ে যদি একটিমাত্র শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণী প্রজাতিগুলিকে আলোচনায় আনা হয় তাহলেও একই চিত্র পাওয়া যাবে। যাইহোক, এত বিশাল পরিসরে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়। মস্তিষ্কের আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক আলোচনার জন্য মানুষ (Homo Sapiens) এবং বিবর্তনের পথে তার কিছু পূর্ববর্তী প্রজাতিকে নমুনা হিসেবে ধরা যাক্।

মানুষের বিবর্তনের পথে মানুষের পূর্ববর্তী প্রজাতিগুলির (Homo Lineage) ক্রম-উত্তোরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যানিয়ামের আভ্যন্তরীন আয়তন অর্থাৎ মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধির একটা প্রবণতা [illegible] (Tobias 19716) কিন্তু এই আয়তন বৃদ্ধির বিষয়টি একটি একক (Individual) প্রজাতির মধ্যে যথার্থভাবে তথ্যভিত্তিক নয়। Homo Habilies এর যে সব জীবাশ্ম মিলেছে তাদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এবিষয়ে ব্যাপক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে।

প্লিস্টোসিনি (Pleistocena) যুগের বাইশটি ক্র্যানিয়াম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে wolpoff (1984) দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এইসব প্রজাতিগুলির মস্তিষ্ক সময় বৃদ্ধির সাথে ক্রমবর্দ্ধমান। wolpoff হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে শেষ দিকে Homo Erectus এর ক্র্যানিয়ামের আয়তন প্রথম দিকের H. Erectus এর ক্র্যানিয়ামের আয়তন থেকে গড়ে প্রায় 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বাইশটি জীবাশ্মর মধ্যে তিনটিকে বাদ দিয়ে এক উল্টো ফল পাওয়া গেল অর্থাৎ মধ্য প্লিস্টোসিনি যুগের শুরুতে মস্তিষ্কের আয়তন সময় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে শুরু করল (Rightmin 1986 C)।

হোমিনিড বর্গে একসময় অস্ট্রালোপিথোসিন ছিল মানুষের পূর্ব প্রজাতি। এদের ক্র্যানিয়ামের আয়তন শুরু হয়েছিল 450 ঘনঃসেঃমিঃ থেকে। এরপর বিবর্তনের পথে প্রজাতি হিসেবে এসেছে পিথেক্যানথ্রোপাস (Pithecanthropus), সিনানথ্রোপাস (Sinanthropus) এবং নিয়ানডার্থাল (Neanderthal)।

সারণী –1

প্রজাতির নাম	ক্র্যানিয়ামের আয়তন (ঘন সেঃমিঃ)	
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
শিম্পাঞ্জী	275	500
গোরিলা	340	752
অস্ট্রালোপিথোসিন	450	700এ
হোমোইরেক্টাস (পিথেক্যানথ্রোপাস সিনানথ্রোপাস)	850	1250
নিয়ানডার্থাল	1100	1750
হোমোস্যাপিয়েন্স	1000	2200

সূত্র : Montagu-1960, Schultz-1926, Tobias-1971

নিয়ানডার্থাল বর্তমান মানুষের নিকটতম পূর্ব প্রজাতি। এখন মানুষের মস্তিষ্কের গড় আয়তন 1345 C.C. এবং বর্তমান মানুষ কর্তৃক এই আয়তন অর্জিত হয়েছিল আনুমানিক এক লক্ষ বছর ধরে বা তারও পূর্বে। অন্যদিকে নিয়ানডার্থালদের মস্তিষ্কের গড় আয়তন ছিল 1450 সেঃমিঃ। অর্থাৎ বর্তমান মানুষের বিবর্তন পরে হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মস্তিষ্কের গড় আয়তন তার নিকটতম পূর্ব প্রজাতির চাইতে বাড়েনি, বরং হ্রাস পেয়েছে।

লিঙ্গভেদে মস্তিষ্কের আয়তনকে কেন্দ্র করে আর এক বিপত্তি, বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। মহিলাদের মস্তিষ্কের গড় আয়তন পুরুষ অপেক্ষা প্রায় দশ শতাংশ কম। বলা বাহুল্য, এজন্য বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য আছে — এরকম উক্তি কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

অঞ্চলভেদেও মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্নতা রয়েছে।

সারণী – 2

অঞ্চলভেদে মানুষের নাম	মস্তিষ্কের আয়তন (ঘন সেঃ মিঃ)
অস্টোলিয়ান অ্যাবরিজিন্স্	1256
নিউ গিনি	1280
ভেদ্দাস (veddas)	1285
আফ্রিকান নিগ্রো	1346
চেক্	1438
সাউথ আফ্রিকান ইন্ডিয়ান	1442
ওয়েস্টার্ন এস্কিমো	1473
ইংরেজ	1480
কোরিয়ান	1490
মোঙ্গল	1573

সূত্র = Montagu 1960

যদি মস্তিষ্কের আয়তনের সাথে বুদ্ধি, প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতার সমানুপাতীক সম্পর্ককে মেনে নিতে হয় তাহলে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশে 2 নং সারণী অনুযায়ী

গুণগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবজগতে মানব মস্তিষ্কের অবস্থান

মস্তিষ্ক তথা সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের একক এক বিশেষ ধরণের দেহ কোষ যাকে বলা হয় নিউরন। নিউরন ছাড়াও আর এক ধরণের কোষ স্নায়ুতন্ত্রে থাকে তাকে বলা হয় নিউরোগ্লিয়াল কোষ। স্নায়বিক অনুভূতি পরিচালনে এই কোষের কোন ভূমিকা নেই। এই কোষ থেকে নিঃসৃত মায়েলিন নিউরনের অ্যাক্সনের আবরণ তৈরী করে। স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনই একমাত্র কার্যকরী কোষ এবং সম্মিলিতভাবে নিউরনের কাজই মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ।

নিউরনের কাজ :

নিউরন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন একজন জার্মান শরীর বিজ্ঞানী (Neuroanatomist) ভিলহেল্‌ম ওয়ালডেয়ার (wilhelm waldayer) 1891 সালে। সাধারণ অন্যান্য দেহকোষ থেকে নিউরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। নিউরনের কোষ-দেহ বাইরের দিকে পরিবর্ধিত হয়ে অসংখ্য তন্তুতে পরিণত হয়। এই তন্তুগুলির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত মোটা এবং বড়। একে অ্যাক্সন বলা হয় এবং অবশিষ্টগুলিকে ডেনড্রাইট্ বলে। অ্যাক্সনের মাধ্যমে বার্তা নিউরন থেকে অন্য নিউরন বা অন্যান্য দেহকোষে পৌঁছায় এবং ডেনড্রাইটের মাধ্যমে নিউরন অপর কোন নিউরন থেকে বা বাইরের পরিবেশ থেকে বার্তা (Information) গ্রহণ করে। অ্যাক্সন বার্তা বহন ক'রে অন্য নিউরন বা অন্য কোন দেহকোষকে প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ধরণের কোষীয় সংযোগস্থলে মিলিত হয়। এই সংযোগস্থলকে সাইন্যাপ্‌স্ বলা হয়।

অ্যাক্সন কীভাবে বার্তা পাঠায় তা নিয়ে চল্লিশের দশকের শেষ দিকেও মতভেদ ছিল। বেশীর ভাগ শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণায় বার্তা পাঠানোর মাধ্যম ছিল তড়িৎ (Electrical)। কিন্তু বার্তা পাঠানোর রাসায়নিক প্রক্রিয়াও ক্রমশঃ দৃঢ় হতে শুরু করে। যাইহোক্, এই শতাব্দির প্রায় মধ্যভাগ থেকে উভয় পদ্ধতিই বার্তা পাঠানোর প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষাতেও দেখা গেছে বার্তা পাঠানোর প্রক্রিয়ায় তড়িৎশক্তি ও রাসায়নিক পদার্থ উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে একে তড়িৎ-রাসায়নিক বার্তা বলে।

তড়িৎশক্তির প্রভাবে বার্তা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল (Action Potential) বলে। Alan Hodgkin এবং Andrew Huxley চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের আয়নীয় ভিত্তি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই প্রক্রিয়ায় তড়িৎ প্রবাহ তৈরী করার জন্য সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও পটাশিয়াম আয়ন (K^+) অংশ গ্রহণ করে। আন্তঃকোষীয় অর্থাৎ দুটি কোষের মধ্যস্থলে Na^+ এর ঘনত্ব থাকে অনেক বেশী এবং K^+ আয়নের ঘনত্ব বেশী থাকে অ্যাক্সনের (Axon) এর মধ্যে। অ্যাক্সনের গাত্র আবরণীর (Plesma Membrane) মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম নালী থাকে। এদের বলা হয় আয়ন চ্যানেল (Ion channel)। আয়ন চ্যানেলের মধ্যে Na^+ ও K^+ এর যাতায়াতের অধিকার অবাধ। আয়ন চ্যানেলকে ভোলটেজ-গেটেড (voltage gated) চ্যানেল বলে। আয়ন চানেলের আভ্যন্তরীণ বিভরের উপর নির্ভর করে চ্যানেলের খোলা থাকা বা বন্ধ থাকা। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন বার্তা চলাচল বন্ধ থাকে (Resting Potential) তখন নিউরনের তড়িৎ বিভব থাকে –60 থেকে –70 mv (মিলিভোল্ট এক ভোল্টের একহাজার ভাগের এক ভাগকে এক মিলিভোল্ট বলে)। অ্যাক্সনের মধ্যে K^+ এর ঘনত্ব খুব বেশী মাত্রায় থাকলেই এটা সম্ভব হয়। ডেনড্রাইট যখন সাইনাপসে আসা বার্তা গ্রহণ করে এবং আন্তঃকোষীয় বিভরের মাত্রা একটা নির্দিষ্ট মাত্রা (অর্থাৎ 55 mv) ছাড়িয়ে যায় তখন অ্যাক্সনের মধ্যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল শুরু হয়। যাইহোক, আন্তঃকোষীয় বিভব 55 mv এ পৌঁছানর পরেই অ্যাক্সনের মধ্যেকার Na^+ চ্যানেলগুলি খুলতে শুরু করে এবং তার মধ্যে Na^+ ঢুকতে শুরু করে। এর ফলে অ্যাক্সনের বিভব মাত্রা খুব দ্রুত উঠা-নামা করতে (– 90 mv থেকে + 40 mv) শুরু করে এবং এক সময়ে + 40 mv এ স্থির হয়ে গেলে Na+ চ্যানেলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক এই সময় K^+ চ্যানেল খুলে যায় এবং K^+ অ্যাক্সনের বাইরে অর্থাৎ সাইনাপ্‌সে মুক্ত হয়। এর ফলে গাত্র-আবরণী (Membrane) পুনরায় তড়িৎ-আহিত (Repolarisation) হয়। Na^+ ও k^+ চ্যানেলের এই সমন্বয়ের ফলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল একটি রেখাতেই বেস্টন করে এবং গাত্র-আবরণীর সাথে যতটুকু স্থান (space) যুক্ত তার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। এই নেটওয়ার্কের মধ্যেই রাসায়নিক নিউরোট্রান্সমিটার সাইনাপ্‌সের প্রান্তদেশে প্রেরক নিউরন কর্তৃক মুক্ত হয় এবং সংলগ্ন গ্রাহক কোষ বা তার ডেনড্রাইট্ কর্তৃক গৃহীত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে নিউরনের একমাত্র কাজ তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ।

নিউরনের এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কোন একদেশদর্শিতা নেই। অর্থাৎ যেসব প্রজাতিতে স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্কের উপস্থিতি রয়েছে তাদের সবার ক্ষেত্রেই নিউরনের কাজ একটাই — তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ। কিন্তু অংশগ্রহণকারী নিউরোট্রান্সমিটারের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা (variation) রয়েছে। নিউরোট্রান্সমিটার বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে যারা নিউরনের মধ্যেই সংশ্লেষিত হয়। এখন পর্যন্ত একশর মতো এ ধরণের যৌগের সন্ধান মিলেছে। এই নিউরোট্রান্সমিটারগুলি দু'ধরণের। যথা নিউরোপেপটাইড এবং ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক যৌগ। নিউরোপেপটাইড আসলে প্রোটিন। DNA/RNA এর সাহায্যে যেমন অন্যান্য দেহকোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় এখানেও বিষয়টি একই। এখানেও কোষটি নিউরন হওয়ার কারণে একে নিউরোপেপটাইড বলে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত নিউরোপেপটাইডগুলির মধ্যে Growth Hormone Releasing Factor Peptide, Vasoactive Intestinal Peptide, Gastric Inhibitory Peptide, Pancreatic Polypeptide, Neurokinin A, Neurokinin B, Oxytocin, Gastrin প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য। নিউরোপেপটাইডগুলির নাম থেকেই এদের কাজের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। যেমন Gastrin অম্লরস নিঃসরণে দায়ীত্বপ্রাপ্ত, Gastric Inhibitory peptide অম্লরস নিঃসরণ বন্ধ করতে দায়ীত্বপ্রাপ্ত ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র অণু নিউরোট্রান্সমিটার নিউরনের সাইটোপ্লাজমে অন্তঃকোষীয় বিপাকের ফলে মধ্যবর্তীকালীন (Intermediary) যৌগ হিসাবে তৈরী হয়। এরা মোটামুটি তিনপ্রকার। যথা অ্যামাইন, বায়োজেনিক অ্যামাইন

ও অ্যামাইনো এসিড। অ্যাসিটাইল কোলাইন, ডোপামাইন, ইন্ডোল অ্যামাইন, γ আমাইনো বিউটারিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডামিক এসিড প্রভৃতি যৌগগুলি ক্ষুদ্র অণু নিউরোট্রান্সমিটারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এটা সহজেই অনুমেয় যে সব ধরণের নিউরোট্রান্সমিটার একই নিউরনে তৈরী হয়না। বরং বিভিন্ন স্নায়ুতন্তুতে বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটার শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী হয়। আবার স্নায়ুতন্ত্রবিশিষ্ট সব প্রজাতিতেই একই ধরণের নিউরোট্রান্সমিটার নাও থাকতে পারে। অধিকাংশ সাধারণ (common) হলেও কোন কোন প্রজাতিতে কিছু অ-সাধারণও (uncommon) হতে পারে। যাইহোক নিউরোট্রান্সমিটারের এই পরিবর্তনীয়তা (variation) ছাড়া সার্বিকভাবে নিউরনের কার্যকরী ভূমিকা একই রকম।

গঠনগতভাবে মস্তিষ্ক একটি অত্যন্ত জটিল সংগঠন। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অংশ যাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রতিটি অংশেরই একক নিউরন। অতএব বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজের পার্থক্যকে একমাত্র নিউরোট্রান্সমিটারের পরিবর্তনীয়তা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর আগে অবশ্য শরীরে স্নায়ুতন্ত্রের প্রয়োজন কতটা তা একটু বুঝে নেওয়া যাক্।

একটি প্রাণী-শরীর স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকাকে দুটো উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে বা কাজে লাগায়। যথা— সমস্ত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে সময়োপযোগীভাবে পরিচালনা করা এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে শরীর নিরপেক্ষ প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। প্রথম উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়না অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মে স্বতস্ফূর্তভাবে শরীরের আভ্যন্তরীণ শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি পরিচালিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন। শরীর নিরপেক্ষ পরিবেশের সাথে কোন ধরাবাধা সম্পর্ক স্থাপনে ও তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ম নেই। অতএব আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে সচেতন প্রয়াসের বিকাশে এবং নিয়ন্ত্রণে স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্কের ভূমিকা আছে কিনা বা থাকলে তা কতটুকু।

আলোচ্য সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতেই কিছু আলোচনা হয়েছে। এই সচেতন প্রয়াসের জন্য একটি প্রজাতি প্রতিনিয়ত যা করে থাকে তাকে প্রজাতির আচরণগত বৈশিষ্ট্য (Behavioural charecter) বলে। এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ যাতে কার্যকরী হতে পারে সেজন্য মস্তিষ্ক ও পরিবেশের মধ্যে কিছু সংযোগকারী অঙ্গ থাকে। যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, স্বরথলি, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি। স্নায়ুতন্ত্রের উপস্থিতি রয়েছে এরকম যে কোন প্রজাতিতেই সমস্ত রকমের সংযোগকারী অঙ্গ রয়েছে তা নয়। যেমন চক্ষুর আবির্ভাব শুরু হয়েছে যুক্তপদ পর্বের প্রাণী থেকে, অমেরুদন্ডীভুক্ত কোন পর্বেই কর্ণের বিবর্তন ঘটেনি, স্বরথলির বিবর্তন সর্বপ্রথম ঘটেছে উভচর শ্রেণীর ব্যাঙের মধ্যে ...ইত্যাদি। এইসব সংযোগকারী অঙ্গের সাহায্যে কোন প্রাণী প্রজাতি যে আচরণসমূহ অনুশীলন করে স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্কর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি তিন ধরণের। যথা অভিজ্ঞতা গ্রহণ, অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ ও অভিজ্ঞতা উদগীরণ। বলা বাহুল্য, মস্তিষ্কর ভূমিকা বলতে এখানে নিউরন সমূহের সম্মিলিত ভূমিকার বাইরে অন্য কিছু নয়। প্রাণী প্রজাতি সমুহের মধ্যে আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুশীলনে ব্যাপক বিভিন্নতা আছে। কিন্তু এই বিভিন্নতার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজাতির মস্তিষ্কে বা স্নায়ুতন্ত্রে পৃথক কোন ব্যবস্থা নেই। যাবতীয় বিভিন্নতা মস্তিষ্কের এই একই কাঠামোতে (Framwork) বাধা। মানুষ নামক প্রজাতিটিও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশকে সচেতন প্রয়াসের উৎস স্থল হিসেবে ভাবার পেছনে শক্তিশালী যুক্তির অভাব। মস্তিষ্কের যে কোন অংশই হোক্ না কেন তার সাংগঠনিক একক নিউরন এবং তা পূর্বোক্ত কাঠামোতে বাধা। এতদ্সত্ত্বেও বুদ্ধি, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা (যা সচেতন প্রয়াসেরই নামান্তর) প্রভৃতির উৎস মস্তিষ্কের মধ্যে খোঁজ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। Halstead বুদ্ধিকে (Intelligence) চারটি বিষয়ের একত্ররূপ হিসেবে প্রস্তাব করেছেন। যথা সংহত ক্ষেত্র (Integrative Field Factor) বিমূর্তন (Abstraction Factor), ক্ষমতা (Power Factor) এবং নির্দেশক (Direrctional Factor)। তিনি এই চারটি বিষয়কেই মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের (Frontal Lobe) করটেক্স-এর স্বাভাবিক কার্যকারীতার উপর আরোপ করেছেন।

Richard Haier প্রস্তাব করেন যে যাদের করটেক্সে বিপাকীয় হার অপেক্ষাকৃত কম তারা বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাদের এই হার অপেক্ষাকৃত বেশী তারা কম বুদ্ধিসম্পন্ন।

Halstead বা Richard Haier কারো প্রস্তাবই পরীক্ষিত নয়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষার অবকাশও যথেষ্ট কম যেহেতু মস্তিষ্কের পূর্বোক্ত কাঠামোর সাথে এইসব প্রস্তাবের কোন সামান্যতম সামঞ্জস্য নেই।

এখন পর্যন্ত মস্তিষ্কের কাঠামোর মধ্যে সৃজনশীলতা বা প্রতিভার (?) উৎস খোঁজার প্রয়াস হিসেবে Roger Sperry এর গবেষণা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। Sperry-এর গবেষণার বিষয় ছিল কমিসারোটমি (Commisrrotomy) নামে একটি রোগ। মস্তিষ্কের ডান এবং বাম হেমিস্ফিয়ারের সংযোগকারী করপাস ক্যালোসাম (Corpus Callosum) নামে পর্দাটি এই রোগে কাটা থাকে। অর্থাৎ দুই হেমিস্ফিয়ার পৃথক থাকে। Sperry নিজে এই রোগীদের উপর সৃজনশীলতার (Creativity) কোন পরীক্ষা চালান নি। কিন্তু তার গবেষণা এ ব্যাপারে বেশ প্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি লক্ষ করলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অযৌক্তিক পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা রয়েছে ডান হোমিস্ফিয়ারের এবং যৌক্তিক ও ভাষাসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা রয়েছে বাম হোমিস্ফিয়ারের। উল্লেখযোগ্য, এই গবেষণার জন্য Sperry নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। 1999 সালে Albert Katz এই গবেষণাপত্রের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন —

"Creative activity cannot be localized as a special function unique to one to the Cerebral hemispheres. Rather productive thought involves the integration Co-ordination processes subserved by both hemispheres. .... There appears to be previlized role in creativity to the Cognitive functions associated with the right hemisphere. .... There is some evidence that different creative tasks may differentially call on Cognitive resources for which the two hemispheres are specialized. .... Finally, there is some evidence that creativity related hemispheric asymmetries can be found both online (as the person

performs a task) and as a consequance of habitual patterns of behaviour"। Katz এর পর্যালোচনা থেকে একটা বিষয় পরিস্কার যে চূড়ান্ত অর্থে বুদ্ধি, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা শব্দগুলি সামগ্রিক আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ফলস্বরূপ (Resultant) এবং এর জন্য মস্তিষ্কে কোন পৃথক নির্দিষ্ট সংস্থান নেই। অতএব মস্তিষ্কের সাথে প্রত্যক্ষাভাবে সচেতন প্রয়াসের সম্পর্ক নির্ণয় করাটাই যেখানে অসাধ্য সেখানে মানব মস্তিষ্কের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের প্রশ্নই ওঠেনা। অর্থাৎ সচেতন প্রয়াস যে কোন জীব প্রজাতিতেই মস্তিষ্ক নিরপেক্ষ বিষয়। প্রাণীজগতে বিচ্ছিন্নভাবে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করা যাক্। (ক) অন্‌সিডারিস (onciderea) এক ধরণের গোবরে পোকার প্রজাতি। এদের মধ্যে স্ত্রী-পোকারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তিনটি এমন পদ্ধতি অনুশীলন করে যা মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিকেও হার মানায়। প্রথমতঃ বন-জঙ্গলে অসংখ্য বিভিন্ন গাছপালা থাকলেও ডিম পাড়ার সময় স্ত্রী-পতঙ্গেরা খুঁজে বার করে এক ধরণের লজ্জাবতী গাছ (Mimose)। বলা বাহুল্য, লজ্জাবতী কাছ এই পতঙ্গের স্থায়ী বাসস্থান নয়। দ্বিতীয়তঃ ডিম পাড়ার আগে স্ত্রী-পতঙ্গ কোন ডালের উপর তার নীচের ধারাল চোয়ালের সাহায্যে একটা লম্বা খাঁজ তৈরী করে এবং এই খাঁজের মধ্যে ডিম পাড়ে। তৃতীয়তঃ স্ত্রি-পতঙ্গ সেই ডালের (যে ডালে ডিম পাড়ে) উপর ডিম পাড়ার খাঁজ থেকে প্রায় 30 cm. পেছন দিকে সরে যায় এবং ডালের চারপাশে একেবারে নিরবিচ্ছিন্ন বৃত্তাকারে খাঁজ তৈরী করতে শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত খাঁজের গভীরতা ক্যাম্বিয়াম (Cambium) কোষকলা ছাড়িয়ে না যায় ততক্ষণ খাঁজ তৈরীর কাজ চলতে থাকে। এই কাজটুকু করতে স্ত্রী পতঙ্গের আট ঘণ্টা সময় লাগে।

স্ত্রী-পতঙ্গের ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রয়াসই তার সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। কিন্তু তৃতীয় প্রয়াসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ডিম থেকে তৈরী হওয়া লার্ভা লজ্জাবতী গাছের সজীব কোষের উপর বেঁচে থাকতে পারে না। এইজন্য স্ত্রী-পতঙ্গের তৃতীয় প্রয়াস। বৃত্তাকার খাঁজ থেকে আগা পর্যন্ত ডালটি মরে যায় এবং মাটিতে পরে যায়। লার্ভাগুলি মৃত ডালটিকে খেয়ে বড় হয় এবং পরবর্তী জনুক্রমে পরিণত হয়। একথা সত্য যে অন্‌সিডারিস প্রজাতিতে স্ত্রী-পতঙ্গেরা তাদের বিবর্তনের পর থেকে হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পদ্ধতিগুলি পূর্ববর্তী জনুক্রমকে অনুকরণ করে অনুশীলন করে আসছে। কিন্তু বিবর্তনের সূচনায় যেসব জনুক্রমের স্ত্রী-পতঙ্গেরা অভিযোজন নির্মাণ করতে গিয়ে এই পদ্ধতিগুলরি বিকাশ ঘটিয়েছিল তাদের প্রতিভা কিছু কম (যদি প্রতিভা শব্দটিকে স্বীকার করে নিতে হয়)? অথচ এদের স্নায়ুতন্ত্র বলতে হাতে গোনা কয়েকটি স্নায়ুতন্তু। অনসিডারিস প্রজাতিটি যুক্তপদ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের সংগঠিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশই ঘটেনি।

খ) পিঁপড়ে একটি অতি সুপরিচিত ক্ষুদ্র প্রাণী প্রজাতি যা যুক্তপদ পর্বভূক্ত। পিঁপড়ের সামাজিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান কমবেশী আমাদের অনেকের কাছেই জানা। তথাপি তাদের সচেতন প্রয়াসের স্তরটা ধরার জন্য অন্ততঃ একটি অনুশীলনের উল্লেখ করছি। ইপ্সিত গন্তব্যে যাওয়ার পথে যদি কখনও পিঁপড়ের দল জলীয় আবর্জনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তারা মাটি বা অন্য কোন পদার্থের ছোট ছোট কণা মুখে করে এনে সেখানে লম্বালম্বিভাবে সাজিয়ে সেতু তৈরী করে নেয়। তারপর তারা সদলবলে সেই সেতুর উপর দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছায়। এটা একটি অতি উন্নত মানের সচেতন প্রয়াস। সম্ভবত এই সচেতন প্রয়াস মানুষ ছাড়া আর অন্য কোন প্রজাতির মধ্যে লক্ষণীয় নয়। অথচ পিঁপড়ের স্নায়ুতন্ত্র পূর্বোক্ত অনসিডারিসের মতই।

জীবজগতে এরকম অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে — একথা আমরা আগেই বলেছি। অতএব উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। এটা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে বুদ্ধি, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি সচেতন প্রয়াসের সুলুক-সন্ধান মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রে নেই। মস্তিষ্কহীন বা মস্তিষ্ক যুক্ত স্নায়ুতন্ত্র এই ব্যাপারে পরোক্ষভাবে একটিই সহযোগিতা করে, তা হোল গ্রাহক অঙ্গের (Receptor organ) মাধ্যমে দেহ নিরপেক্ষ পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ, তার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তার উদগীরণ। অবশ্য এখানেও একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আছে। জীবজগতে এমন বহু প্রজাতি আছে যাদের দেহে, স্নায়ুতন্ত্র দূরে থাক্, বিচ্ছিন্নভাবে কোন নিউরনের অস্তিত্বও নেই। এদের মধ্যে কি আচরণগত বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন অনুপস্থিত? বাস্তবটা তা নয়। এদের মধ্যেও এই অনুশীলন উপস্থিত। তাহলে কিভাবে তা সংঘটিত হয়? এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন মন্তব্য করার মত গবেষণালব্ধ তথ্য নেই। এখন পর্যন্ত বিষয়টা ভবিষ্যতের হাতে।

মস্তিষ্কের গুণগত বিশ্লেষণে যদি নিউরনের ভূমিকাকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাহলে সেই ভূমিকার স্থায়ী অংশটি দাঁড়ায় অ্যাকশন পোটেনশিয়াল এবং নিউরোট্রান্সমিটারের সংশ্লেষণ। এটা যে কোন নিউরনের ক্ষেত্রে সাধারণ। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির মস্তিষ্কে তথা স্নায়ুতন্ত্রে একই সংখ্যায় এবং একই রকমের নিউরোট্রান্সমিটার নাও তৈরী হতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতিতে নিউরোট্রান্সমিটারের এই পরিবর্তনীয়তার জন্য গুণগত বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর এই পার্থক্যের কোন প্রভাব নেই। এই কারণে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে ও মস্তিষ্কতেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলি একান্তভাবেই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক। সচেতন প্রয়াস দূরে থাক, এর সাথে আচরণগত বৈশিষ্ট্যেরও কোন সম্পর্ক নেই।

এতএব অভিযোজন ব্যবস্থা নির্মাণ বা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ-যাই হোক্ না কেন, মস্তিষ্কর সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

তথ্য সূত্র ঃ

G. Philip Rightmin – The Evolution of Homo Erectus.

P.A.M. Dongen – Brain Size in vertebrates Published in the 3rd Vol. of The Central Nervous Systern of vertebrates–1998

James H. Schwartz – Neurotransmitters – Paper Published in Encyclopedia of the Human Brain by V.S. Ramchandran

John A. White – Action Potential – Paper Published in Encyclopedia of the Human Brain by V.S. Ramchandran

Rober J. Sternberg & James C. Kaufman – Intelligence – Paper Published in Encyclopedia of the Human Brain by V.S. Ramchandran

Mark A. Runco – Creativity – Paper Published in Encyclopedia of the Human Brain by V.S. Ramchandran

Maryann E. Martone & Mark H. Ellisman – Neuron – Paper Published in Encyclopedia of the Human Brain by V.S. Ramchandran.